"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৭তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অনলাইন : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

৭৭ তম অনলাইন সংখ্যা

৬ই ভাদ্র, ১৪৩৩ / 24.08.2026

-ঃ সম্পাদক ঃ-

সুনন্দন ঘোষ

https://www.parthasarathipatrika.com

- সূচিপত্র -

(৭৭ তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্ম-কথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
পবিত্র-স্মৃতি	শ্রী রঘুনন্দন দাস
আদিবাসী ও হিন্দু সংস্কৃতি	শ্রীগোপীনাথ সেন
পা রেখেছি পাটনায়	শ্রীঅরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
মুহূর্ত	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

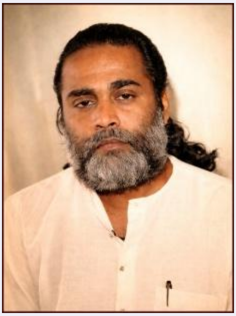

[১০.০৩.১৯২৬ – ২৪.১১.১৯৮৬]

- প্রীতি কণা -

"জীবনে গীতার মাধ্যমে যোগ সাধনার প্রথম দীক্ষা পিতৃদেবের কাছে। তিনিই এই সংসার জীবন- সংগ্রামে সারথি ছিলেন ও আছেন। যোগের মূল যে শিক্ষা – তাঁর কাছেই পাই। জীবনের সকল বাধা বিঘ্নর যে বৈতরণী – তা পার হতে পেরেছি তাঁরই কৃপায়। তারপর জীবনের নানা ধাপে পেয়েছি এক একজন সাধক ও মহাপুরুষের সান্নিধ্য, সাহচর্য ও কৃপা। অনিলবরণ দিয়েছেন গীতা প্রচারের প্রেরনা, ধর্ম প্রচারের সহায়তা, অফুরন্ত স্নেহ ও কৃপা। তাছাড়া জীবনে শত শত লোকের সংস্পর্শ এনে দিয়েছে বিমল আনন্দ ও সুখ। প্রতিটি জীবনের স্পর্শই আমার হৃদয়ের একটি আফোটা ফুলকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। তেমনি প্রতিটি জীবনের স্পর্শ অনেক বেশি করে আমার চৈত্য পুরুষকে জাগ্রত করেছে।, নিয়ে গিয়েছে অধ্যাত্ম জীবনের আরো গভীরে। তাই প্রতিদিনই, প্রতি মুহূর্তই উপলব্ধি করেছি সেই পরম পুরুষের সান্নিধ্য, উপস্থিতি ও স্পর্শ। কখনও কখনও তিনি আমাকে পূর্ণভাবে এই সংসার থেকে পৃথক করে নিয়েছেন – তিনি আমাকে একাত্মভাবে চান বলে। সংসারের সমস্ত কিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, তাঁর কাজ পূর্ণভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য। "

এবার আমার দীর্ঘদিন বাড়ীতে কাটছে। কোনও নির্দিষ্ট কাজ করতে পারছি না। পরীক্ষার duty-গুলি আগে করে ফেলেছি, তাই আমাকে এখন আর কলেজেও যেতে হচ্ছে না। এবার শিক্ষাকর্মীদের কর্মবিরতির ফলে এক সপ্তাহ কলেজ ছুটি গেল। এরপর আবার পরীক্ষা হবে। শেষ হতে সেই ৩রা/৪ঠা ফেব্রুয়ারী। তারপর আবার আমার কাজ। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা।

আজকাল কোনও কাজই কেউ সময়মতো করে না। তাই যে কোনও কাজ শেষ করতে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায়। আজকাল এই পার্থসারথি ছেপে বেরোতে মাস শেষ হয়ে যায়। আসলে আমাদের পত্রিকা আকারে আয়তনে ছোট। কে আর এর উপর নজর দেয়! আমিতো স্যালারি না পেলে প্রেসে টাকা দিতে পারি না। আর এ বিষয়ে নিয়মিত কেউ সাহায্য করেন না। তাই আমি ও শ্রীমান সুনন্দন এই ছোট্ট পত্রিকাটি নিয়ে ঠুকঠুক করে এগোচ্ছি। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হয়েছেন সাত বছর পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি যা ব্যয় করতেন এখন তার দ্বিগুণ টাকা ব্যয় হয়। তবু শুধু জেদের বশে পত্রিকাটি চলছে।

নীরেনদা ১৯৮৬-৮৭ সালে অনেক ভাবে সাহায্য করে পত্রিকাটি চালাবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কি আর একটানা সাহায্য একজনের পক্ষে করা সম্ভব? তাছাড়া তাঁর নিজস্ব অসুস্থতা তো আছেই। তার মধ্যে আমার দুবার মাথা এক্স-রে করা হয়ে গেল। ‘সাইনাস’ পাওয়া গেল। রীতিমত ওষুধ খেলাম। এখনও মাথা মাঝে মাঝে ভার হয়ে থাকে। পেটে একটা অপারেশন হয়ে গেল। পায়ে তিনবার এক্স-রে করে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করতে হোল। তাও আমি চলে বেড়াচ্ছি।

বাড়ীতে সমস্ত কাজ করছি। নিজের রোজগারে নিজের খরচ চালাচ্ছি। আসলে ভগবান সবাইকে বিশ্রাম করবার, ক্লান্ত হলে শুয়ে থাকবার ভাগ্য দেন না। নিজে যত পরিশ্রম করি বা সুখ কামনা করি না কেন, "প্রারব্ধ" বলে বিষয়টাকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এর মধ্যে বড়দিনের ছুটিতে আমার লক্ষ্ণৌ যাবার প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেল। ভেবেছিলাম বারাসত গিয়ে থাকব। আমার পুত্তরের অসহযোগিতার জন্য আমার সেই টিকিট ফেরৎ দিতে হোল। কিশোর আমাকে আবার টিকিট এনে দিয়েছে। এবার না গেলে আমায় শেষ করে দেবে। আসলে বাচেন্দ্রীকে ছেড়ে আমার এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। তার এখনকার গতিবিধিগুলি শুধু উপভোগ করবার। আধো আধো কথা বলা। সারাদিন ধরে দুষ্টুমী করা, যা দেখা তাই নকল করা, চিন্তা করা যায় না সে সব দেখে শুনে কি মজায় সময় কাটে!

আমার মতো নির্লজ্জ মহিলা তো পৃথিবীতে দুটি নেই। তাই আমি নিশ্চয়ই সেই আঘাত পাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারি - যদি শুনি আমার পুত্তর বলছে, "আমিও তো আশা করতে পারি আমার মেয়ে আমার কাছে থাকবে, ঘুমোবে।" এখনও সেরকম কিছু না ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটতে তো পারে!

অনেক সময় ভাবি আমার ছেলেটা তো সত্যি ভালো ছিল। কোনও রকম হীন কথাবার্তা তার ছিল না, স্বার্থপর সে একেবারেই না, তবে মাঝে মাঝে উগ্র ভাবে কথাবার্তা বলে ওঠে কেন? নিজের কাছে নিজে যা জবাব পাই তা হোল, কোনও ভাবেই তার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ আমাকে ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে না। তার পৌরুষ প্রকাশিত হচ্ছে না, তাই সে মাঝে মাঝে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আমার মাঝে মাঝে

মনে হয় কোথাও গিয়ে একমাস বা একবছর কাটিয়ে আসি, তাহলে বোঝা যাবে সংসারে অর্থনৈতিক বা কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে আমার প্রয়োজন আছে কিনা। এই যে এত বড় একটা সংসারের বোঝা মাথায় নিয়ে নিয়ম করে কর্তব্য করে চলেছি, এতো বোঝা যাবে না যতক্ষণ সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করব। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই।

কিশোর আজকাল আমাকে প্রায়ই ওর কাছে গিয়ে থাকতে বলে। কারণটা বুঝি না। তবু আজকাল মাঝে মধ্যে ওদের কাছে গিয়ে এক রাত্তির থেকে আসি। নিজেই ভাবি ভগবান কেন এত অকরুণ! যাকে যা দেবার, তাকে তা দেন না কেন? যার যা পাবার সে তা পায় না কেন? কিশোর আজকাল সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করছে। আমি তাকে অনেকবার বিশ্রাম নিতে বলেছি। কিন্তু সে তীরের বেগে এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে তার একটু বিশ্রাম করবার দরকার। সে গোটা ব্যাপারটাই তার মামা অর্থাৎ শ্রীপ্রীতিকুমারের উপর ছেড়ে দিয়েছে। শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন, "খোদার উপর খোদকারি চলে না।" আমাদের প্রয়োজন তো অনেক, তার শেষ নেই। কিন্তু একটা জায়গায় তো সকলকেই থামতে হয়। জোর জবরদস্তি করে ক্লান্ত হবার কি দরকার? আসলে ব্যাপারটা হোল কি আমি কিশোরের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। কিশোর ভালো থাকলে আমাদের সবার আনন্দ। তাই আমার ইচ্ছে কিশোর আর একটু বেশী বিশ্রাম নিক। শরীরটাকে যত্ন করে রাখতে হয়।

বেশ কিছুদিন ধরে আমি একজন সাধুর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই গত সাত বছর ধরে যোগাযোগ করতে পারছি না। তিনি তাঁর ভক্তদের কি অপূর্ব শিবলিঙ্গ বা রুদ্রাক্ষ উপহার দেন। আমার শুধু দেখবার ইচ্ছে আমার বেলায় তাঁর ঝুলি থেকে কি বেরোয়। একদিন একটি বাড়ীতে তাঁর আসবার

কথা ছিল। আমি সেখানে পৌঁছাবার আগেই তিনি ফোন করেছেন, তাঁর শরীর খারাপের জন্য তিনি আসতে পারবেন না। আমার খুব হাসি পেলো। শ্রীপ্রীতিকুমারের কলকাঠি নাড়া ছাড়া আর অন্য কিছু বলে আমার মনে হয়নি। তবে এবার তিনি একদিন আমার সাথে দেখা করতে আসবেন বলেছেন যদি সুস্থ থাকেন এবং বেশীদিন কলকাতায় থাকেন। জানি না কবে সে সময় আসবে। সামনের রবিবার এলে আমার সাথে দেখা হবে না। তবে বুঝব আমার সাথে যোগাযোগ করা আর হচ্ছে না। আমার তো আসক্তি শিবলিঙ্গে। আটখানি জোগাড় করেছি। আর চারটি বাকী আছে। তাহলে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ আমার ঠাকুরের আসনে জায়গা নেবেন। আজকাল গঙ্গাস্নান করি না। তাই গঙ্গাজলের খুব আকাল। আমার শিবঠাকুররা এখন শাওয়ারের নীচে স্নান করছেন। আসলে যস্মিন দেশে যদাচার। ওই শিবলিঙ্গদের অনেক পাপ তাই আমার পাল্লায় পড়েছেন। এই তো যখন বাড়ীতে থাকিনা তাঁরা নিজের জায়গায় অটল, অচল হয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু আছেন ভালোই দলবেঁধে। আর চার জন এসে পড়লেই পুরো Team হয়ে যাবে। শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন আর দেড়মাস পরেই। এবার নীরেনদা সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর শরীর খারাপ থাকলেও আমি জানি ঐদিন তিনি আসবেনই। আমাদের এখন মাঝখানে সরস্বতী পূজা আছে। এই বার মাসে তের পার্বনের মধ্য দিয়ে আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের আপনজনেদের সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখছি। তবে ইদানীং আমার একটি গুণ হয়েছে। কেউ না এলে তাকে আর “এসো, এসো" করি না। যে যার ইচ্ছেতে আসবে, ইচ্ছেতে আসবে না। আমার জীবনে আর আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আমিও ধূম-ধাড়াক্কা সব জায়গায় গিয়ে বসে থাকি না। আমারও ভীষণ সংস্কার আছে। আগে ছিলাম সোচ্চার। অভিযোগ, অভিমান কত করতাম, কিন্তু এখন নীরব হয়ে গেছি। দেখে যাবার মতো মানসিকতা তৈরী হচ্ছে। আমার তৈরী হতে বছর

দুয়েক লাগবে। তারপর নিশ্চয়ই একটা পরিবর্তন আসবে। খুব সোজা কথাটাই বলি, আমি বাকসিদ্ধ হতে চাই। যদি হয়ে যাই তাহলে কি হবে? অতএব, জনসাধারণ সাবধান! আমি আবার একটুতে রেগে যেতাম তো! যদি আবার সেরকম রাগি? তাহলে? .....

(** রচনাকাল – ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪)

পবিত্র-স্মৃতি **শ্রী রঘুনন্দন দাস**

যে মহান্ আধারের স্মৃতি-চারণ উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের একজন পূর্ণ নিষ্ঠাবান ভক্ত সাধক; শ্রীঅরবিন্দ-প্রদত্ত 'পবিত্র' নামেই তিনি আশ্রমে পরিচিত ছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের মুখ্য শিষ্যদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম। অমৃতদা'র মতো ইনিও স্থূলদেহপাশ হ'তে মুক্তিলাভ করেছেন ১৬ই মে, ১৯৬৯ তারিখে প্রাতঃ নয় ঘটিকার সময় তাঁর আশ্রম-আবাসে। স্বল্প ব্যবধানে পর-পর দুইটি সদানন্দময় পুরুষ চিরতরে চলে গেছিলেন আমাদের মরদৃষ্টির অন্তরালে।

বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে শুনে এসেছি যে, অবতারপুরুষ যখন যে স্থানে অবস্থান করেন তখন সেখানে বহু জিজ্ঞাসু আধার এসে সমবেত হন অহৈতুক এক

আকর্ষণে, এমন-কি অনেক ভক্ত-আত্মা সে-স্থলে বৃক্ষরূপেও অবস্থান করেন সে পবিত্র ভূমির মৃত্তিকারসে আত্মপুষ্টি লাভের জন্য এবং ফুল-ফল বিতরণে প্রভুর সেবার জন্য । শোনা যায়, কোনো সময়ে কোনও একটি তীর্থক্ষেত্রে একটি কৃষ্ণ-মন্দিরের অনতিদূরে একটি চম্পকবৃক্ষ ছিল, তার পাশ দিয়েই যানবাহন চলাচলের রাস্তা। পথের ধারে যানবাহন চলাচলে সেই বৃক্ষটি বাধাস্বরূপ পরিগণিত হওয়ায় জেলা বোর্ডের কর্তৃপক্ষ সেই গাছটিকে কেটে ফেলার হুকুম দেন। কৃষ্ণ-মন্দিরের পূজারী সে-খবর জানতে পেরে ভাবেন - এতকাল তিনি ঐ বৃক্ষের পুষ্প দিয়ে বিগ্রহের পূজা ক'রে আসছেন, বৃক্ষটি নষ্ট হ'লে তাঁর পুষ্প-সংগ্রহে সমস্যা দেখা দিবে। তিনি সেদিন রাত্রে এক স্বপ্ন দেখলেন - পুষ্প-বৃক্ষটি পূজারীকে স্বপ্নে বলছে – "আমি এতকাল প্রভুর পূজার জন্য পুষ্প বিতরণ ক'রে আসছি, এখনও আমার প্রভুর সেবার কাল শেষ হয়নি; তুমি ওদের নিষেধ করবে - ওরা যেন আমাকে কেটে না ফেলে। কালকে রাত্রেই আমি তোমাদের মন্দির সীমানার মাঝে স'রে যাবো।" সেই রাত্রির পরদিন বিস্ময়ের সহিত সবাই দেখে ফুলগাছটি মন্দির-এলাকার মাঝে দাঁড়িয়ে। এই ঘটনার পর থেকে সেই বিগ্রহের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুষ্পবৃক্ষটিও সকলের পূজা পেতে থাকে।

আমাদের আশ্রমের কোনো বৃক্ষের একটি ডাল কাটবারও কারো অধিকার নাই মায়ের অনুমতি ব্যতিরেকে। মা বলেন – "তোমরা আমার অনুমতি না নিয়ে বা আমাকে না জানিয়ে যদি কোনো গাছের ডাল কেটে ফেল তখন সেই গাছ আমার কাছে এসে নালিশ জানায়।"

কোন ভক্ত কী ভাবে যে অবতার-পুরুষের সান্নিধ্যে বাস করেন তা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগোচরে। নানা শ্রেণীর ভক্ত নানা ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে হাজির হন

এসে যুগাবতারের পাদমূলে। বাল্যকালে আমাদের অমৃতদা তাঁদের গ্রামের একটি পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে একদিন সান্ধ্য-আকাশে দেখেছিলেন একটি স্বচ্ছ নীলবর্ণের তারকা উদিত হ'য়ে ক্রমে অদৃশ্য হ'য়ে যায় দক্ষিণে পণ্ডিচেরীর দিকে। পরে, এই ঘটনাকে সেই অন্বেষু বালকের অন্তঃকরণ গ্রহণ করে তাঁর পণ্ডিচেরী যাত্রার ইঙ্গিতরূপে।

ফরাসী দেশে B. P. St. Hilaire-এর (পবিত্রদা') যৌবনকালেই প্রাণে এষণা জাগে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের, এই অধ্যাত্ম-পিপাসা ক্রমেই তাঁর অন্তরে তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের সেনা-বাহিনীতে জেনারেলরূপে জার্মান-অভিযানের সময় তিনি ফ্লুতে আক্রান্ত হ'য়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, সেই রোগশয্যাতেই তাঁর প্রাণে জেগে ওঠে মৃত্যুজয়ের অদম্য স্পৃহা এবং সুস্পষ্টরূপে তিনি এ-সত্য উপলব্ধি করেন যে, অধ্যাত্মসিদ্ধি ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষে মৃত্যুজয় অসম্ভব। ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিদ্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে থিয়োসফিস্ট প্রচারিত পুস্তকাদি পাঠে। তিনি ছিলেন "Ecole Polytechnic" বিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট - কৃতবিদ ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিক। তাঁর জীবনক্ষেত্রে উজ্বল ভবিষ্যতের সব আশায় জলাঞ্জলী দিয়ে তিনি উধাও হন মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ-প্রাপ্তির এক দুর্ব্বার প্রেরণায়; অধ্যাত্ম-সিদ্ধি অর্জনের পথে যোগ্য দিশারীর সন্ধানে বেরিয়ে চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত পরিভ্রমণ ক'রে সিংহল হ'য়ে তিনি পুণ্যভূমি ভারতে এসে উপনীত হন পণ্ডিচেরী সিন্ধুতীরে শ্রীঅরবিন্দের আকর্ষণে। সেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পূর্ণযোগে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তিনি দীর্ঘ ৪৪ বৎসর অতিবাহিত করেন মা - শ্রীঅরবিন্দের চরণতলে তাঁদের কর্মে ও সেবায়। আশ্রম-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টররূপে তিনি দীর্ঘকাল নিষ্ঠাভরে প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিচালনা করেন

নিরলসভাবে সানন্দচিত্তে। শুচি-শুভ্র-আধার এই সাধকের সংস্পর্শে মন-প্রাণে এক বিমল আনন্দের ভাব স্বতঃই জেগে উঠতো। আমাদের পবিত্রদা' সত্যই ছিলেন পবিত্রতার জীবন্ত বিগ্রহ; তাই-না শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে 'পবিত্র'-নামে ভূষিত করেছিলেন। শিশুর অনাবিল আনন্দ ও সারল্য ছিল পবিত্রদা'র জীবনের স্বাভাবিক সম্পদ। তাই আশ্রমের শিশুরা তাঁর মাঝে খুঁজে পেত তাদের আপনজন, তারা পবিত্রদা'র হাত ধ'রে ঝুলে চলতো দ্বিধাহীণ প্রাণে আনন্দের সাথে।

আমি এবং আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী পরীচাঁদ যখন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের অনুমতিলাভে প্রথম শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে পণ্ডিচেরী আসি তখন আশ্রমের সাধকদের মধ্যে দু'জন ইউরোপীয়ানকে দেখি, এদের একজন ছিলেন 'আর্জব' (ইংরেজ চ্যাডউইক), অপর-জন পবিত্রদা'। আমাদের অগ্রজপ্রতিম অন্তরঙ্গ বন্ধু ঋষভচাঁদ আমাদের আসার দু'বছর আগেই আশ্রমে চলে এসেছেন। তখন আশ্রমে শতাধিক স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন; আশ্রমের পরিবেশ তখন ছিল এক গভীর গাম্ভীর্যে পূর্ণ। তখন প্রাতঃকালে মাকে প্রণামের সময় এবং মায়ের সঙ্গে সান্ধ্য-ধ্যানের সময় সবাই মিলে আমরা সমবেত হতাম মেডিটেশন হলে। সেবার মাসাধিক কাল আশ্রমে বাস ক'রে এইসব একনিষ্ঠ সাধকদের সাথে একসঙ্গে ধ্যান ও মাতৃ-প্রণামের সুযোগ আমি গ্রহণ করি। প্রথমবার আশ্রমে এসেই আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাসের সৌভাগ্য আমার হয়নি। নিজের স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ পোষণের জন্য শ্রীঅরবিন্দের আদেশক্রমে সেবার আমাকে আমার কর্মক্ষেত্র কলকাতায় ফিরে যেতে হয়; শ্রীঅরবিন্দকে আমার পারিবারিক অবস্থার বিষয় সব জানালে তিনি আমাকে নিজের হাতে লিখে পরিষ্কার জানিয়ে দেন- 'For you to stay here as a permanent Sadhak is not possible. You must go back and do your sadhana there'. আমার বন্ধু

পরীচাঁদ কিন্তু আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাসের জন্য প্রথমবারেই তৈরী হয়ে আসে এবং তখন থেকেই আশ্রমে থেকে যায়। সেবার ২৪শে নভেম্বরের দর্শনে মা - শ্রীঅরবিন্দের যুগল চরণে যাথা রেখে প্রণাম করে এক সাথে তাঁদের যুগ্ম স্পর্শ পেয়ে এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে মায়ের কোলে মাথা রেখে মাকে প্রণাম করে জীবন আমার তখন ভরপুর। সদা-হাস্যময়ী মাকে হৃদয়ে বেঁধে এবং পবিত্রদা' ইত্যাদি সদানন্দ সাধকদের স্মৃতি মনে বহন করে আমি সেবার বাংলায় ফিরে যাই। তারপর মা - শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে কয়েকবার পণ্ডিচেরী যাতায়াতের পর গত ১৯৪৫ সালে স্থায়ীভাবে সপরিবারে আশ্রমে এসে পবিত্রদা' ইত্যাদি সাধকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশার সুযোগ পাই। খেলার মাঠে একসঙ্গে ফিজিক্যাল মার্চিং ছাড়া আশ্রমের ব্যায়ামশালায় পবিত্রদার সাথে একসঙ্গে ব্যায়ামও কিছুদিন করি। পবিত্রদা একান্ত নিষ্ঠাভরে নানা ভাবে শরীর সাধনা করে চলতেন; সান্ধ্যকালীন মার্চিং ও ব্যায়াম ছাড়াও তিনি সমুদ্র-তীরের বীচ রোড ধরে ছুটে চলতেন সকালে-বিকালে নিয়মিত-ভাবে। এই সর্ববিদ্যাবিশারদ সুযোগ্য আধারটিকে শ্রীমা নির্বাচিত করে-ছিলেন তাঁর মোটর চালকরূপে শুরু থেকেই; জগদ্ধাত্রী দেবীর তিনি ছিলেন বাহন। কবি নিশিকান্তের ভাষায়- “ .... জগৎ ধারণ কর, আমি করি জগদ্ধাত্রী দেবীরে ধারণ।" সত্যিই পবিত্রদা' জগদ্ধাত্রী-দেবীর বাহনরূপে যেন মাকে বয়ে নিয়ে চলতেন মায়ের প্রয়োজনে। দোতলায় মায়ের কক্ষের নিকটেই পবিত্রদা'র বাস-কক্ষ ছিল; মা প্রত্যহ ভোরে ব্যালকনিতে যাবার সময় পবিত্রদা'র ঘরের মধ্যে দিয়েই যেতেন; কোনো দিন যদি মা দেখতেন পবিত্র তখনও ঘুমোচ্ছে তা' হলে মা তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। বহু দিক দিয়ে মায়ের একান্ত নির্ভরের পাত্র ছিলেন পবিত্রদা'। কতভাবেই যে তিনি মায়ের সেবা ক'রে চলেছিলেন তার সব খবর সকলের জানাও নেই।

সাধন-জীবনে অগ্রগতির পথে সাধককে বহু বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়, বিশেষ করে সেই সব সাধককে যাঁরা বিশেষভাবে নির্বাচিত; বিরুদ্ধশক্তিরা প্রথমে আক্রমণ করে তাঁদের মন-প্রাণ-চিত্তকে। তাদের সেই আক্রমণকে হটিয়ে দিয়ে সাধক যখন তাঁর মন-প্রাণের আনন্দ ও সঙ্গতাকে বজায় রেখে এগিয়ে চলেন সিদ্ধির পথে তখন সেই বিরুদ্ধ-শক্তিরা এসে আক্রমণ করে তাঁর দেহকে। পবিত্রদা'র দেহেও এসেছিল এই বিরুদ্ধ-শক্তির আক্রমণ, যার ফলে শেষের জীবনে কিছুকাল তাঁকে প্রায় চলৎ-শক্তিহীন অবস্থায় কাটাতে হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসাদির ফলে এবং স্বীয় মনোবলের সহায়ে তাঁর পূর্ব শক্তি ফিরে না পেলেও, হেঁটে বেড়াতে তিনি সক্ষম হন। তাঁর দেহ-ত্যাগের কয়েকমাস পূর্বে একদিন দেখি তিনি সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আশ্রমের দিকে ফিরছেন। অনেকদিন পরে পবিত্রদা'র সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা। মনের আনন্দে তাঁর দিকে চাইতেই তিনিও আমাকে স্মিতহাস্যে প্রীতি নিবেদন করলেন; দেখলাম সেই রুগ্ন অবস্থাতেও তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল থেকে যেন পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তি উথলে পড়ছে, এমনই পরিপূর্ণ-ভাবে তিনি জয় করেছিলেন তাঁর সব দুঃখ অবসাদকে! সেদিন সকালের দিকে পবিত্রদা'র সেই পবিত্র দর্শনে আমার মন-প্রাণ ভ'রে গিয়েছিল আনন্দে ও তৃপ্তিতে!

জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলে সাধক তার জীবনে পরমা সিদ্ধি অর্জন করে থাকে। পবিত্রদা'র সাধনা তাঁর পূর্ব-জন্মের তপস্যা ও প্রচেষ্টার ফলে এতদূর এগিয়েছিল যে, এই জন্মেই দেহত্যাগের প্রাক্-মুহূর্তে তিনি সম্পূর্ণরূপে মাতৃ-চেতনার মাঝে এক হয়ে তাঁর স্থূলদেহ থেকে মুক্ত হলেন। শ্রীমা পবিত্রদা'র দেহত্যাগের বিষয়ে মন্তব্য করে পরিষ্কারভাবে সে-কথা বলেছেন - "It was very interesting the experience I had that night. Nothing like it I had ever in my

life. It was the night before the day he passed away. The time was 9 o' clock. I felt he was withdrawing, withdrawing in an extraordinary manner, He was coming out of himself and gathering and pouring himself into me..."

"... I say it was wonderful. I never experienced such, the flow stopped when there was little left in the body..."

"As he was in life, he could not have done the thing. I did not expect it of him; it must have been some past life of him that was at work and did the thing. Not many yogis, not even among the greatest could do such a thing. ... He is merged in me, that is, wholly dwelling within me, not dissolved, however, he has his personality intact..."

"A remarkable story, a great and a very difficult thing Pavitra has done."

ভারতের একই মাটিতে আদিবাসী ও হিন্দু সংস্কৃতি দুটি পৃথক পৃথক সংস্কৃতির যে বিশাল শাখাপ্রশাখা বিস্তার লাভ করেছিল তার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতে আগত অধ্যাপকদ্বয় আর রেডফিল্ড এবং এম সিঙ্গার ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তম ভারতীয় আদিবাসী ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে সবিশেষ অনুশীলন করেছিলেন।

ডক্টর এম ম্যারিয়ট ভারতীয় আদিবাসীদের আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সাধারণ গ্রাম্য কৃষকদের তুলনামূলক আলোচনা করেন। লোক সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আদিবাসী ও হিন্দু সংস্কৃতির গঠন ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করেছে। যদিও এর বহুস্থানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও তার প্রভাব দুই সংস্কৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী কেন্দ্রগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে জানা যায় আটচল্লিশ শতাংশ আদিবাসী যারা নিজেদের প্রাচীন জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনযাপন করছে আর বাহান্ন শতাংশ আদিবাসী তাদের পরিজন হিন্দুগণের আচার অনুষ্ঠান অবলম্বন করে নিজেদের হিন্দু বলে প্রচার করে থাকে। ভারতে বৃহত্তর হিন্দু সংস্কৃতি এই ক্ষুদ্র আদিবাসীদের মনোবলকে ক্ষুণ্ণ করতে সচেষ্ট হলেও কিন্তু আদিবাসীকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। কোন কোন স্থানে হিন্দু সংস্কৃতিকে আদিবাসীদের সংস্কৃতির কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আদিবাসী সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতার হেতু এই বিরাট সংস্কৃতির স্বীকৃতি শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হতে পারেনি। আদিবাসীদের সামাজিক ও সংস্কৃতির রীতিনীতি সাধারণ হিন্দু কৃষকশ্রেণী থেকে অভিন্ন। আদিবাসী সংস্কৃতি অদৃশ্যভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে অনুসিক্ত করেছে। ১৯৫২ সালে এ.এল. ক্রোবের

তাঁর 'দি এনসিয়েন্ট ঔকুমেনে' অর্থাৎ সংস্কৃতির স্বরূপ গ্রন্থে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, ‘আদিবাসীগণ নিজেদের ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ সভ্যতার পরিবেশ ছাড়া অন্য কোন সভ্যতা গ্রহণে অনিচ্ছুক। তাদের কাছে পশ্চাদপদ সভ্যতার যতখানি মূল্য তাহা ব্যতীত অন্য কোন সভ্যতার অপেক্ষা রাখে না। আদিবাসী সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য প্রথম সোপান হিসাবে ধরা যেতে পারে। মধ্যে মধ্যে ঐতিহাসিক বিপর্যয়ে দুটি সংস্কৃতির অর্থাৎ আদিম ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে ছেদ পড়েছিল। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্যতা আদিম ও সাধারণ হিন্দু গ্রামবাসীদের একই গ্রামে অবস্থান হেতু দুটি সংস্কৃতির মধ্যে যে সেতুর সৃষ্টি হয়েছে তার চরিত্র বাহিরে থেকে ধরা কঠিন। এই দুই সংস্কৃতি একটি অপরটিকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছিল তা ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদগণ যেমন রিজলে, হাটন, শরৎচন্দ্র রায়, ওমালে, এলউইন ও আরও অনেকে আলোচনা করেছেন। তাঁরা আদিমবাসী ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের মিল দেখিয়েছিলেন।

প্রাচীন যুগে যখন আর্যগণ বৈদিক হিন্দু ধর্ম ভারতে প্রচার করেছিলেন তখন তার সঙ্গে আদিম জাতিদের ধর্ম সংমিশ্রিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতেরও দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে আদিবাসী ধর্মের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে বিশদে জানা যায় না। ১৯৪৯ সালে এম. ম্যারিয়ট তাঁর ‘ভারতে জাতির উৎপত্তি’ নামক গ্রন্থে মধ্যভারতের এগারোটি আদিম জাতিদের সামাজিক গঠনের বিশ্লেষণ করেছেন। ম্যারিয়ট দেখিয়েছেন আদিবাসী সমাজে হিন্দু সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভারতবর্ষের অদিবাসী সংস্কৃতির পর্যালোচনা করতে হলে ভৌগোলিক আকারে ভারতকে চারটি ভাগে ভাগ করে আদিবাসী সংস্কৃতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে। অক্সফোর্ড অভিধানে লিখিত আছে, ভারতীয় আদিবাসী অর্থে যারা আর্য ও দ্রাবিড় জাতিদের আসার আগে থেকে ভারতে বসবাস করছিল। বৈদিক

যুগেও ভারতে যে আদিবাসী ছিল তার পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বিন্ধপর্বতে ছিল নিষাদ, কিরাত, বিলাস, নাহালক, পুলিন্দ ও ব্রহ্মর। তামিল সাহিত্যেও দক্ষিণ ভারতের বহু প্রাচীন উপজাতিদের বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ভি. বল্লভভাই এর ইংরাজি গ্রন্থে বিল্লভার ও মিশাভার নামক দুটি সুপ্রাচীন আদিম জাতিদের আজও সন্ধান পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে আদিবাসীর মধ্যে চেঞ্চু উপজাতিগণ অন্ধ্রপ্রদেশের কেন্দ্রে বসবাস করে এবং চেঞ্চু ব্যতীত পুলায়াণ, কাদার, উড়ালি, কানিকার, ইয়েরুডা ও কুরুম্বা উপজাতিগণই প্রধান। ভারতীয় নৃতত্ববিদ্গণ এই উপজাতিদের নিয়ে খুব অল্পই আলোচনা করেছেন। আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম. বি. ইমানিউ নীলগিরি, কোটা আদিবাসীদের লোক কথা ও তাদের ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার তুলনা মূলক আলোচনা করেছেন। ১৮৮৫ সালে এস, এম, নটেসা শাস্ত্রী ইন্ডিয়ান এনটিকুয়েরী নামক পত্রিকার তামিল লোককথার সঙ্গে কোটা, কুরগ এবং টোডা জাতিদের ভাষা ও লোককথার মধ্যে মিল দেখিয়েছেন। এই আদিবাসীদের কথা ও সংস্কৃতির মধ্যে বৈদিক আর্যদের সংস্কৃতির সঙ্গে সুসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মধ্যভারতে অষ্ট্রিক গোষ্ঠী আদিবাসীদের মধ্যে ভীল ও কোল আদিবাসী আর্য ভাষায় কথাবার্তা বলে। গোণ্ড, খন্দ, ওরাঁও এবং মালপাহারিয়াগণ তাদের পূর্বপুরুষ অনুযায়ী দ্রাবিড় ভাষায় নিজেদের মনের ভাব আদানপ্রদান করে থাকে। ১৮৫০ সালে মোক্ষমূলার অস্ট্রিক গোষ্ঠীর নূতন নামকরণ করেন ‘মুণ্ডা’। এই নাম অনুযায়ী অস্ট্রিক গোষ্ঠী উপজাতিদের নামকরণ করা হয়েছে।

ওড়িষ্যার আদিবাসী কেয়নঝড়ের জুয়াং ও পাললহরা, তাদের পরণে গাছের বল্কল আর তারা কোদাল ও গাইতি দিয়ে মাটি খুঁড়ে খাদ্য আহরণ করে। বোনাই-এর ভূঁইয়াগণ বহুদূর গ্রাম্য প্রতিবেশীর মত জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে। এই

আদিবাসীদের কুটিরগুলি বেশ শক্ত ভিতের ওপর তৈরী। তাদের শিল্প চেতনা উভয় কারু ও চারুশিল্প ক্ষেত্রকে বিশেষ উন্নত করেছে। ওড়িয়ার উপজাতিদের সামাজিক জীবন অন্যান্য গ্রামীণ হিন্দুদের মত অতিবাহিত হয়। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ তাদের দৈনন্দিন জীবনের অনুশাসন করে থাকে। প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের মত তারা শক্তির দ্বারা কন্যা হরণ করে বিবাহ করে। তাদের সামাজিক জীবন সাঁওতাল, ভীল ও আদিবাসীদের মত। ওড়িশার উপজাতি যুবক ও যুবতীদের নিজ নিজ 'ধুমকুরিয়া' যৌবন শিক্ষা কেন্দ্র আছে। তাদের আনন্দের সঙ্গী নৃত্য, গীত ও বাদ্য। এই উপজাতিদের ধর্ম বলতে তারা কোন নির্দিষ্ট দেবদেবীকে পূজা করে না। তাদের উপাস্য দেবতা কোন অলৌকিক অশরীরী আত্মা যার স্পন্দন তারা সবসময় অনুভব করে এবং তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মন্ত্রতন্ত্র বলে পশুবলি দেয়। খন্দ আদিবাসীগণ এখনও যারা সভ্য শ্রেণীদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি তারা তাদের উপাস্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য গভীর জঙ্গলের মধ্যে নরবলি দিয়ে থাকে - এই থেকে হিন্দু তান্ত্রিক কাপালিকগণের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

উত্তর পূর্ব সীমান্তে তিব্বতি-চীন ও তিব্বতি-বর্মী জাতীয় আদিবাসীদের দেখা যায়। তিব্বত-ব্রহ্ম জাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে লেপচা ও গুরুং প্রধান। উত্তর আসাম অরুণাচলের আদিবাসীদের মধ্যে আকা, ডাফলা, আবর, মিরি ও মিসমি এবং নাগা ভাষাভাষীদের মধ্যে নাগা আর মণিপুরের আদিবাসীদের মধ্যে কুকি, লুসাই ও মৈতে প্রধান। গাড়ো পাহাড় থেকে পার্বত্য ত্রিপুরা পর্যন্ত বোড়ো উপজাতিদের বাস। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিকির ও খাসিয়া দুই শ্রেণীর উপজাতিদের দেখা যায়। প্রতিটি আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান পদ্ধতি আছে যাহা সাধারণ হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিল দেখা যায়।

ভারতের নানান বৈচিত্রময় সংস্কৃতির মধ্যে একটি নিজস্ব সত্তা আছে তাহা সুপ্রাচীনকাল থেকে জাহ্নবীর মত প্রবাহিত হচ্ছে। ভারতীয় আদিবাসীগণকে আপাত দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে অন্যান্য গ্রামীণ হিন্দুদের নিকট থেকে তাদের বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হয় না। এই দুটি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যেন একটি ঐক্যতানের সুর ভেসে আসে। তার সবিশেষ অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও অনুশীলন করা প্রয়োজন। আদিবাসীদের প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) শিকার ও সংগ্রহকারী আদিবাসীগণ :- পাহাড়িয়া খাসিয়া, পাহিরা এবং ছোটনাগপুরের বিরহোর।

(খ) প্রধানতঃ পরিবর্তিত কিষাণ আদিবাসীগণ:- পাহাড়িয়া ভূঁইয়া, জুয়াং এবং ওড়িষার খন্দ, কোরওয়া, বাইগা, মধ্যপ্রদেশের পাহাড়িয়া গোণ্ড, চেঞ্চু ।

(গ) স্থায়ী কিষাণ আদিবাসীগণ:- মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, দুধখারিয়া, বাতহুরি, ভূমিজ, ওঁরাও এবং দক্ষিণ বিহার ও ওড়িষার শবর, হায়দ্রাবাদ ও মধ্য প্রদেশের রাজগণ্ড।

এই উপরিউক্ত আদিবাসীগণ ভারতের হিন্দু কিষাণদের মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ যে তাদের নিজ নিজ কার্য-কলাপ বিশ্লেষণ না করলে বিশেষ দুটি সংস্কৃতির প্রভেদ বুঝা কঠিন। তবে, এ দুটি সংস্কৃতির পারস্পরিক যোগাযোগের পূর্বে তাদের বাসস্থান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো, আদর্শগত বিভেদ ও সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

আদিবাসীগণ সাধারণতঃ পর্বতে ও অরণ্যে বাস করে। তাদের গ্রামগুলি পাহাড়ের পাদদেশে ও নদীর কিনারায়। কিন্তু গ্রাম্য হিন্দু অধিবাসীগণ বনজঙ্গল থেকে অনতিদূরে এবং নদীর সন্নিকটে বসবাস করে। এই দুটি সম্প্রদায়ের জীবন তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় আদিবাসীগণ গ্রাম্য হিন্দু জনগণের

অপেক্ষা অধিকতর শান্তিপ্রিয় ও সরল জীবন যাপনে নিজেদের যুক্ত করে রাখে। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন নির্ভর করে তাদের পশু, মৎস্য ও নানা জীবজন্তু শিকারের মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া তারা কৃষিকাজ করে থাকে তবে তার পদ্ধতি সাধারণ গ্রাম্য হিন্দু কৃষকদের থেকে কিছুটা ভিন্ন। ভারতের বহু আদিবাসীদের কোন স্থায়ী কৃষি আবাদের জমি নেই সেকারণে তারা 'সিফটিং কালটিভেসন' অর্থাৎ পরিবর্তিত কৃষি আবাদের উপর নির্ভর করে থাকে। কৃষিজাত ব্যতীত তারা লোহার জিনিষপত্র তৈরী, ঝুড়ি ও মাটির জিনিষপত্র নির্মাণ ও নানান প্রকার সূতি হস্তশিল্পেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। ভারতের জুয়াং আদিবাসীগণ মাটির জিনিষ তৈরীতে বেশ পটু এবং ‘লোহারা’ নামের আদিবাসীগণ লোহার দ্রব্য ও মাহালি উপজাতিরা বাঁশের ঝুড়ি তৈরীর কাজে সিদ্ধহস্ত। আদিবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক পারস্পরিক লেনদেন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তারা নিজেদের দ্রব্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক আদান প্রদান করে থাকে। বিরহোর উপজাতিগণ হো ও মুণ্ডা আদিবাসীদের দড়ি ও মধু দিয়ে তার পরিবর্তে তাদের তৈরী ঝুড়ি ও অন্যান্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করে। মুণ্ডাগণ অসুর উপজাতিদের কাছ থেকে লোহার যন্ত্রপাতি পেয়ে থাকে। স্থায়ী কৃষি কার্যে যে সকল আদিবাসী নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছে তাদের মধ্যে হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও ভূমিজ প্রধান। তারা কৃষি আবাদের মধ্য দিয়ে নিজেদের অর্থ নৈতিক জীবনকে উন্নত করতে সমর্থ হয়েছে কিন্তু এখনও তাদের নিকটতম প্রতিবেশী হিন্দু কৃষিজীবিদের সমপর্যায়ে আসতে সক্ষম হয়নি।

আদিবাসী সামাজিক সাংগঠনিক কাঠামো বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভারতের আদিবাসীগণ তাদের নিজ নিজ সমাজ সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতিগুলি পালন করে। সাঁওতাল, হো এবং মুণ্ডা আদিবাসীগণের সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা থাকলে সাধারণ বনবাসী আদিবাসীদের সমাজ জীবনের

মোটামুটি জীবনধারা জানা যায়। এই সকল আদিবাসীগণ নিজেদের বলে 'হোর' অর্থাৎ 'মানুষ' আর অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের কাছে হল 'দিকু' বা 'ডিকু' অর্থাৎ অসম্পৃক্তজন। তাদের নিজ জাতির সঙ্গে যে শাখা উপজাতিদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে তারা তাদের সঙ্গে কোন প্রকার সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও সম্বন্ধ স্থাপন করে না। আদিবাসীগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উপাধি ও সম্পত্তি ভোগ করে থাকে। তাদের মধ্যে থেকে একজন গ্রাম্য প্রধান, গ্রাম্যপুরোহিত এবং ওঝা নির্ধারিত হয়। গ্রাম্যপ্রধানই আদিবাসী গ্রাম্য জনগণের সকল সামাজিক বাদ বিসম্বাদের ও ন্যায় অন্যায় বিচার করে। তাকে সাহায্য করার জন্য বৃদ্ধদের নিয়ে একটি সভা গঠিত হয়। এই সভার মতামত তাদের জীবনের জটিলতা দূরীভূত করে। হিন্দু গ্রামবাসীদের জীবনধারা একটা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছে ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ হিন্দু চতুর্বর্ণকে অনুশাসন করে থাকে। আদিবাসী ও হিন্দু গ্রামবাসীদের মধ্যে যে সকল পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার রীতি এবং পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক হলেও এর মূলভিত্তি একই প্রকারের। আদিবাসী ও হিন্দুগণ উভয়েই প্রকৃতির পূজা করে আসছে। হিন্দুদের মত আদিবাসীগণ সূর্যের উপাসক। আদিবাসীদের কোন উপাসনার স্থান বা মন্দির নেই। তারা কোন প্রকার মূর্তি পূজা করে না। শাল, অশ্বত্থ ও বটগাছের গুড়িকে লাল সিঁদুর মাখিয়ে সেখানে কয়েকটি নুড়ি রেখে স্বরচিত মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে পূজা করে এবং সেখানে পশুবলি দিয়ে থাকে। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে কোন ঐশ্বরিক প্রেরণার দ্বারা তাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান চালিত হচ্ছে। তারা মনে করে কোন অপার্থিব শক্তি প্রতিনিয়ত সাংসারিক ভালমন্দ প্রাকৃতিক জয়বিপর্যয় ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চালিত করে। আদিবাসীরা হিন্দুদের মত স্বর্গ নরক বা পাপপুণ্য বলে কিছু মনে করে না। তারা মনে করে মৃত্যুর পর আত্মা তাদের মৃত পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত

হয় ও গ্রাম এবং গৃহের মঙ্গল করে। যদি কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় তাহলে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা সংসারে অমঙ্গল করে থাকে। এরূপ ধারণা হিন্দু প্রতিবেশীদের মধ্যেও দেখা যায়। আদিবাসীদের শুভ ও অশুভ বোধ যাদুবিদ্যা ও ভূতপ্রেতের প্রতি অবিচল বিশ্বাস থেকে সূচিত হয়। হিন্দুগণের সঙ্গে আদিবাসীদের ধর্মের তুলনা করতে গিয়ে বহু নৃতত্ত্ববিদগণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তারা হিন্দুদের অংশ বলা যেতে পারে। অধ্যাপক জি, এম ঘুরইয়ে তাঁর 'দি এবোরজিন' গ্রন্থে লিখেছেন- ‘কিছু কিছু জঙ্গল ও পার্বত্য আদিবাসী ব্যতীত অধিকাংশ আদিবাসীদের হিন্দু সমাজভুক্ত করা যেতে পারে। যদিও আমাদের সুবিধা অনুযায়ী তাদের আদিবাসী বলা হয় কিন্তু তাদেরকে উচ্চ সম্প্রদায় হিন্দু না বলে অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায় বললেও অত্যুক্তি হয় না।’ নৃতত্ত্ববিদ সুরজিত সিংহ **১৯৫৭** সালে ম্যান-ইন-ইন্ডিয়া পত্রিকায় লিখিত ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতি নামক প্রবন্ধে সাধারণ হিন্দু কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে সমতলবাসী আদিবাসীদের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন সাধারণ নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের সঙ্গে ভারতীয় কোন উপজাতিদের আচার অনুষ্ঠানে বিশেষ পার্থক্য নেই। তবুও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সমাজ এই আদিবাসীদের বর্ণহিন্দু সমাজ থেকে বহুদূরে সরিয়ে রেখেছে। অধ্যাপক জি. ম্যানডেলবম তাঁর ‘কালচার চেঞ্জ এ্যান্ড নীলগিরি ট্রাইব’ নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জাতির সঙ্গে আদিবাসীদের সংস্কৃতির খুবই সামান্য প্রভেদ দেখা যায়।’ নৃতত্ত্ববিদ সুরজিৎ সিংহ ম্যানডেলবমের যুক্তির সমর্থন করতে গিয়ে যে প্রমাণ দেখিয়েছেন তার ইংরাজী মূল বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা হল কারণ ভারত সরকার স্বাধীনতার অনেক দশক পরেও আদিবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক কোন সংজ্ঞা দিতে সক্ষম হন নি। “There is indeed some castes in India seem to share with the tribals the following characteristics emphasis on equality in social

behavior within one's own ethnic group, considerable freedom of cultural participation for the women, value system being little burdened by puritanical asceticism. Further the supernaturalism of these lowest castes has come similarity with that of the tribes, in that, their pantheon primarily consists of local gods, while their supernaturalism is rarely accompanied by ethical considerations. Through economic backwardness, social segregation and a general lack of direct access to literate Hindu traditions, the lowest Hindu castes are in comparative isolation from the central current of the development of sophisticated Hinduism; this being more or less similar to the situation among the tribes. Yet, even with these important similarities the main feature that distinguishes the cultures of the lowest castes from those of the tribals is that while the former accept, may be somewhat grudgingly, their inferior status in a larger social system the tribals live in a comparatively more easily defined, self-sufficient social and ideological world.” আদিবাসীরা মূলতঃ প্রকৃতি-পূজারী। তারা ঐতিহ্যগত ভাবে ‘animism’ অর্থাৎ প্রকৃতি-বাদে বিশ্বাসী। জাতিতত্ত্ববিদ রিজলে বলেছেন, ‘Hinduism as animism more or less transformed by philosophy’. হিন্দু-ইজমের সঙ্গে এনিমিজমের কোন বিভেদ নেই যেন পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

ভারতের আদি হিন্দুসভ্যতা ও সামাজিক গঠনপ্রণালীর সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দ্রাবিড় ও মুণ্ডা উপজাতিদের সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রাক্ হিন্দু-সংস্কৃতি গঠিত হয়েছিল। আদিবাসীদের হাস্যলাস্য গীত বাদ্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ধারক ও বাহক। ভারতের মনীষীগণ আনন্দের মধ্যে দিয়ে সাধনার পথ নিদর্শন করেছেন, গীত ও নৃত্য তারই পথপ্রদর্শক। আদিবাসীগণের জীবন প্রবাহে গীত ও নৃত্যের স্থান উচ্চে। তারা নিজেদের জীবন-সাধনায় আনন্দকে জাত্য হিসাবে গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে মহাপ্রস্থানের পথে। আদি-জানীদের কাছে সংসার নিত্য নয় অনিত্যও নয়, তাদের কাছে আমরা ছিলাম, আমরা আছি ও আমরা থাকব এই ভাবনার ব্যাঞ্জনায় অনুপ্রাণিত। তাদের সংস্কৃতি সলিলে অবগাহন করলে বহু অমৃতের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পা রেখেছি পাটনায়

শ্রীঅরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য

যে পাটনা স্টেশনকে শুধু ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখে উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহর অথবা তীর্থস্থানে গেছি, ২০১৮-র সেপ্টেম্বরের আগে সেখানে কিন্তু পা রাখা হয়নি। তারপর ২০২৩ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করোনার সময়টুকু বাদ দিয়ে বারবার পাটনা শহরে এলেও হঠাৎ আবার ২০২৬-এর জুনে পাটনার বিহার মিউজিয়াম দেখার আগে, এই শহর নিয়ে কখনও কিছু লেখার ইচ্ছে মনে জাগেনি। অথচ ৪৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অজাতশত্রুর আমলে পাটলিপুত্রের (আজকের পাটনা) পত্তন শুরু হওয়ার পর মৌর্য, গুপ্ত এবং পাল রাজাদের রাজধানী হওয়ার সুবাদে এই শহর নিয়ে লেখার

কোন রসদের অভাব তো ছিল না। এমনকি ১১৯৭ সালে মুসলিমদের কাছে হেরে যাওয়ার পরেও পাঠান মোগল আর বাংলার নবাবদের আমলের পাটনার গল্প আমরা শুনতে পেয়েছি। তবে সেসব আজ ইতিহাসই বটে। ব্রিটিশ জমানায় বাংলা প্রভিন্স থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা পায় বিহার। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভাষার ভিত্তিতে বিহার রাজ্য তৈরী হলে পাটনা আবারও হয়ে ওঠে রাজধানী নগরী। আজকের রাজধানী শহর অবশ্য নতুন করে গড়ে উঠেছে গঙ্গা ও শোন নদীর বুকে ইতিহাসের কুসুমপুরে। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ১৫ কিলোমিটার জুড়ে সুন্দর পরিকল্পিত শহর। প্রশস্ত রাজপথ আর পাটনা জংশন, রাজেন্দ্রনগর, পাটনা সাহিব রেল স্টেশন সমৃদ্ধ এই পাটনায় অবশ্য পুরানো দিনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর – তার জন্য যেতে হবে এখানকার দুই বিখ্যাত যাদুঘর ‘পাটনা’ ও ‘বিহার’ মিউজিয়ামে। ভারতের অন্যতম পুরানো ১৯১৭ সালের পাটনা মিউজিয়ামের বিশেষ আকর্ষণ প্রায় ২০ কোটি বছরের পুরানো এক গাছের জীবাশ্ম! ৫৩ ফুট লম্বা এই জীবাশ্মটিকে ১৯২৭ সালে আসানসোলের কাছে পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে তা পাটনা মিউজিয়ামে দান করা হয়। গঙ্গা গ্যালারিতে স্টেইনলেস স্টিলের সাপোর্ট দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রদর্শিত এই বিস্ময়কর ফসিল সমেত মৌর্য-গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য, মূর্তি, মুদ্রা, এবং দুষ্প্রাপ্য তিব্বতিয় চিত্রকলা দেখার খরচ মাত্রই জনপ্রতি ১৫ টাকা। তুলনায় ২.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বেইলি রোডের কাছে ‘বিহার মিউজিয়াম’ একেবারেই আধুনিক। ২০১৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে এখানকার ‘শিশুদের যাদুঘর’ অংশে সাধারণের প্রবেশাধিকার মিলেছে। শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব সহ বাকি সাত গ্যালারি প্রদর্শিত হতে শুরু করে তারও দু বছর পর – ২০১৭-র অক্টোবর থেকে। সামগ্রিক ভাবে বিহার মিউজিয়ামের ধারণা পেতে দেখতেই হবে ‘ওরিয়েন্টেশন’ গ্যালারি আর মানস চক্ষে অতীতচারী হতে হলে আধঘন্টা কাটাতে হবে গ্যালারির শেষে যে

থিয়েটার হল আছে, সেখানে প্রদর্শিত তথ্য চিত্র দেখো। প্রসঙ্গত বলে রাখি দুই মিউজিয়ামের সময়সূচি একটু হলেও আলাদা। পাটনা মিউজিয়াম সকাল ১০.৩০ থেকে বিকেল ৪.৩০ টা পর্যন্ত খোলা থাকলেও বিহার মিউজিয়ামের সময় সকাল ১০ থেকে বিকেল ৫টা। সোমবার অবশ্য দুই মিউজিয়ামই বন্ধ থাকে, তবে পাটনার তুলনায় বিহার মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য কিন্তু প্রায় সাত গুণ – ১০০ টাকা।

আজকের পাটনার হৃদপিণ্ড যদি হয় গান্ধী ময়দান, তবে রেলষ্টেশন, বিমানবন্দর, রাজভবন, হাইকোর্ট আর মিউজিয়াম নিয়ে জমজমাট তার বাম অলিন্দ। তুলনায় ধূলিধূসরিত আর ঘিঞ্জি হলেও ইতিহাসের পাটনাকে খুঁজতে হবে শহরের পূর্ব প্রান্তেই। গান্ধী ময়দানের পূর্বে গঙ্গার তীরে রয়েছে পাটনার অন্যতম আকর্ষণ ‘গোলঘর’। ১৭৭০ সালের মন্বন্তরের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত ব্রিটিশরাজ তার ফৌজের খাদ্য শস্য সংরক্ষণের জন্য ১৭৮৬ সালে যে ১৪০,০০০ টনের সংগ্রহ শালা তৈরী করেন, আজকের সেই কেন্দ্রীয় শস্যাগার শুধু কাজেই নয়, বাহারে পর্যটকের চোখ টানে। এছাড়া রাজভবনের কাছে পশুশালা, প্ল্যানেটোরিয়াম, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের বসতবাটি, ‘সদাকত আশ্রম’ আর ‘গান্ধী সংগ্রহালয়’ নিয়ে যে পাটনা তাকে কম সময়ে দেখে নেওয়া গেলেও, জংশন থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পূর্বে দশম তথা শেষ শিখ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মস্থান ঘিরে যে শিখতীর্থ তখত ‘শ্রী হরমন্দির সাহিব’ বা ‘পাটনা সাহিব’ গড়ে উঠেছে সেখানে একটা বেলা না কাটালে পাটনা দর্শন অসম্পূর্ণ। ভুললে চলবে না পবিত্রতায় পাঁচ তখতের দ্বিতীয় এই ‘হরমন্দির জী’র স্থান কিন্তু অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের পরেই। এছাড়া হরমন্দির লাগোয়া দুর্গের ধ্বংসাবশেষের উপর পাঠান স্থাপত্যে শের শাহ সুরির গড়া ১৫৪০ এর শের শাহী মসজিদ আজও অনন্য। এরপর শের শাহের ‘কিল্লা হাউস’ দেখে বিকেলটা রেখে দিন দীঘা-শোনপুর সংযোগকারী ৪.৫৬ কিলোমিটার ব্রিজসহ দীঘা ঘাটের জন্য।

গঙ্গার উপর দিয়ে তৈরী রেল কাম রোড এই সেতুর কাছেই রয়েছে নৌ-বিহারের আকর্ষণ। এখানেই তৈরী হয়েছে পর্যটকদের নতুন আকর্ষণ ‘মেরিন ড্রাইভ’। বম্বের সাথে তুলনা করছি না, কিন্তু পাটনা বেড়াতে এসে মেরিন ড্রাইভের সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত না দেখলে জানতেও পারবেন না কোন সুন্দর আপনার কাছে এসেও দুরে রয়ে গেল। সময় যাদের কাছে সোনার চেয়েও দামী তারা হয়তো দু’দিনেই পাটনাকে মোটামুটি দেখে নিতে পারবেন, কিন্তু আমাদের মত যারা অবসরে, তারা এই পাটনা থেকেই চলে যেতে পারেন ১০১ কিলোমিটার দক্ষিণে গয়া-বুদ্ধগয়া দেখে আরও ৬১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পাঁচ পাহাড়ের দেশ রাজগীরে। সময় বেশি থাকলে বেনারস ঘুরে আসারও অসুবিধা নেই। দুরত্ব তো বেশি নয়, মাত্রই ২৭৫ কিলোমিটার। গয়া, রাজগীর, বেনারসের কথা এখন থাক, এর প্রত্যেকটি নিয়েই আলাদা করে ভ্রমণ কাহিনী লেখা যায়। বরং এখানে ২০১৯ এর ডিসেম্বরের গল্পটা বলি, যেবার পাটনা সাহিব দেখার পর একই ড্রাইভারের সাথে পর দিনের ভ্রমণে দেখে এসেছিলাম ৬০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বের ‘বৈশালী’ নগরী। পর্যটন মানচিত্রে বৈশালী কিছুটা ব্রাত্য হলেও নতুন করে সে যে আবার প্রচারের আলোয় আসছে সেটা বুঝতে পারা যায় যখন দেখি বুদ্ধগয়ার মতই এখানেও ইদানিং নতুন করে ভক্তরা ভিড় জমাচ্ছে জাপানী বুদ্ধ মন্দির, থাই মনাস্ট্রি আর ভিয়েতনাম বৌদ্ধ স্তূপের বৈশালিতে। পাটনার মত বৈশালীরও ইতিহাস কিন্তু আজকের নয়। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের গণতান্ত্রিক রাজ্য হিসাবে এখানকার খ্যাতির উল্লেখ রামায়ণেও আছে। লিচ্ছবিরাজ ইক্ষাকুর পুত্র যে বিশালরাজের নামে বিশালপুরী হয়েছে বৈশালী, বাসস্ট্যান্ডের কাছে সেই বিশাল কা গড় আজ মাটির স্তূপে পরিণত হলেও ৭৭০৭ সদস্যের পার্লামেন্ট হাউস ছিল অতীতের এই বিশাল গড়। তাছাড়া বৈশালী শুধু বুদ্ধের আগমনের কারণেই ধন্য হয়নি, নিকটবর্তী ‘কুম্ভগ্রামে’ শেষ জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরেরও জন্ম হয়েছিল

বলে শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। এহেন বৈশালী পৌঁছাতে ড্রাইভার মুসাফির যখন গঙ্গার ওপরে তৈরী হওয়া পাটনা-হাজিপুর জোড়া লম্বা সাত কিলোমিটার গান্ধী সেতু পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তার সৌন্দর্য দেখে মনে হয়েছিল - আর কেন? এইতো যথেষ্ট। তারপর অবশ্য দু'ঘণ্টার কম সময়ে 'অভিষেক পুষ্করিণী' তথা করোনেশন ট্যাঙ্কের কাছে পৌঁছাবার পর ঘণ্টা চারেকের পরিক্রমায় লিচ্ছবি রাজাদের কীর্তি কাহিনী থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব, অশোক, রাজনর্তকী আম্রপালী যখন মানস চক্ষে ভেসে উঠেছে, তখন আর 'কেন এলাম' চিন্তাটা মনে আসেনি। যে অভিষেক পুষ্করিণীর পবিত্র জলে পূত হয়ে সেকালে বৈশালীর রাজারা শপথ নিতে যেতেন আজ যথাযথ সংস্কারের অভাবে সে জলাশয় জঙ্গল-জঞ্জালে লুকিয়ে গেলেও রেলিং ঘেরা পুষ্করিণী ঘাট আমাদের অন্তত অতীতচারী করেছিল। কাছেই বিশ্বশান্তি স্তূপে রয়েছে বুদ্ধের চারমূর্তি – বার্থ (জন্ম), এনলাইটমেন্ট (বুদ্ধত্ব), সারমন (ধর্মপ্রচার) এবং নির্বাণ। বৈশালীর আশেপাশে খনন কার্যের ফলে আহৃত প্রত্নতত্ত্বের সম্ভার সংরক্ষণের জন্য যে মিউজিয়াম তৈরী হয়েছে, শুক্রবার ছাড়া যে কোন দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টায় সেখানে প্রবেশাধিকার মেলে। প্রবেশ মূল্য মাত্রই ২০ টাকা। চতুর্মুখী মহাদেব মিউজিয়ামের পাশেই 'বৈশালী গেস্ট হাউস'। তবে দেখে শুনে যা বুঝেছি শুধু দেখার জন্য ওখানে থাকার তেমন দরকার হয় না। আমাদের মতো ঘণ্টা চারেকই যথেষ্ট। থাকতে চাইলে এখন বিহার ট্যুরিজমের ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসেও থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, তবে অফিসিয়াল কাজের জন্য ছাড়া সাধারণ ট্যুরিস্ট সেখানে নেই বললেই চলে। বৈশালীর আরেক আকর্ষণ রাজ্য জুড়ে অশোকের গড়া ৩০ টি পিলারের অন্যতম এক অশোক স্তম্ভ। তবে ১৮.৩ মিটার উঁচু বেলেপাথরের এই পিলারের মাথায় উল্টানো পদ্মের ওপর সিংহ মূর্তি দেখতে যেতে হয়েছিল 'কলুহা'য় – প্রায় চার কিলোমিটার দূরে। বৈশালীকে ঘিরে যে ১৩টি বৌদ্ধ স্তূপ গড়ে

উঠেছিল তার মধ্যে স্তূপ-১ রয়েছে পিলারের সামনেই। অদূরে চতুর্থ শতকের স্বয়ম্ভু দেবতা চতুর্মুখী মহাদেব। সামান্য গেলে মিউজিয়ামের পথে ১৯৫৮-য় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ স্তূপ-১। ছড়িয়ে ছিটিয়ে মোটের ওপর ঠিক কত স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বৈশালীতে রয়েছে তা বলা মুশকিল, তবে ১৯৫৮'য় আবিষ্কৃত স্তূপটি যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে লিচ্ছবি রাজারা বুদ্ধের দেহাবশেষের ওপর বানিয়ে ছিলেন, প্রত্নতাত্বিকদের মতে সে ব্যাপারে কোন ভুল নেই। পরবর্তীকালে মৌর্য, শুঙ্গ এবং কুষান আমলে লিচ্ছবি রাজাদের গড়া ছোট মাটির স্তূপ অনেক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। খননে প্রাপ্ত একটি কাস্কেটের ভিতরে পাওয়া ভস্মীভূত মাটি, ছোট শঙ্খ, কাঁচের পুঁতি, সোনার টুকরো এবং তামার পাঞ্চ-মার্কড মুদ্রাও নীরবে ঐতিহাসিকদের অনেক কথা শুনিয়েছে।

আধুনিক পাটনার তুলনায় বৈশালী যে একেবারেই অন্য ধরনের সেটা বলাই বাহুল্য। তবে আমরা সাধারণ পর্যটক যারা ইতিহাসে আগ্রহী অথচ ঐতিহাসিক নই, তাদের ভ্রমণে যদি বৈশালীর সাথে 'নালন্দা', 'সারনাথ' অথবা মধ্যপ্রদেশের 'সাঁচী'র স্মৃতি উঁকি দিয়ে যায় তবে বলার কিছু নেই। সর্ব ক্ষেত্রেই ইতিহাসের সাক্ষীরা আমাদের কাছে মূক কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে নয়।

মেরিন ড্রাইভ থেকে সূর্যাস্ত

পাটনা সাহিব

বিহার মিউজিয়াম

অস্ত্র, বিহার মিউজিয়াম

বিশ্ব শান্তি স্তূপ, বৈশালী

মুহূর্ত

সুনন্দন ঘোষ

এই মুহূর্তটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই –
রঙ তুলিতে, আলোকচিত্রে, কলমের ছোঁয়ায় ....
যেদিন থাকব না,
মুহূর্তটা থেকে যাবে।
ওয়েনাডের এডাক্কাল গুহায় নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ
ধরে রেখেছিলো তাদের মুহূর্তগুলো নির্বাক ইঙ্গিতে,
ইলোরায় স্বপ্ন মূর্ত হল ভাস্করের ছেনি হাতুড়িতে,
ভীমবেটকায় গুহাচিত্রে।

কত কথা বলেছি জীবনভর,
কত কথা লিখেছি মনের খেয়ালে
আসক্তির গোলকধাঁধায় নিজেকে হারিয়ে।
মুহূর্তের পর মুহূর্ত সাজিয়ে স্মৃতির মালা
মলিন হয়ে যাবে সময়ের দীর্ঘশ্বাসে।

নিজেকে দেখার সময় এবার – সত্যের মুখোমুখি ।
এই পড়ন্ত বেলায় আকুল প্রতীক্ষা
একটা সোনালী ক্ষণের --
অতিমানসের আলো স্পর্শ করার
অমৃত মুহূর্তের।